মহামানবের সৃষ্টির আয়োজন (২য় পর্ব)

সুধীর কুমার দত্ত

গত সংখ্যার পর

মানুষের বেলায় এই ক্লোনিং পদ্ধতি কেন ব্যবহার করা যাবে না সে বিষয় কোনো সহজ উত্তর পাওয়া সময়ের ব্যাপার। ডলিকে ক্লোনিং করার কাজে নিয়োজিত বিজ্ঞানীদের ধারণা মাত্র দুবছরের মধ্যেই তারা মানুষের ক্লোন তৈরিতে সক্ষম হবেন। বিজ্ঞানীদের এই ভবিষ্যদ্বাণী জনমনে ক্লোনিঙের প্রচ্ছন্ন সুবিধাগুলো নিয়ে উৎসাহ জাগতে থাকে। যেসব বাচ্চার শৈশবেই মৃত্যু হবে ক্লোনিং করে অবিকল ঐরূপ বাচ্চা তৈরি করা গেলে মার দুঃখ লাঘব করা যাবে। এ ছাড়া শৈল্য চিকিৎসায় দেহের অকেজো বা ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ প্রতিস্থাপন করতে ক্লোন দারুণ ভূমিকা পালন করবে। অনেকে আবার এ শঙ্কা ব্যক্ত করেন যে পুরো মাত্রায় ক্লোন পদ্ধতি চালু হলে পুরুষরা সমাজে বাড়তি সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে কারণ সন্তান উৎপাদনে তাদের কোনো ভূমিকা থাকবে না, ফুরিয়ে যাবে যৌন প্রজননের প্রয়োজনীয়তা।

ক্লোনিঙে সৃষ্ট মানুষ যদিও বাহ্যিক রূপে অবিকল কোষদাতার মতো হবে তবু তার ব্যক্তিত্ব ও আনুষঙ্গিক অনেক বৈশিষ্ট্যেই পার্থক্য থাকবে যেমনটি দেখা যায় দুটি অভিন্ন যমজ সন্তানের মধ্যে। এর কারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য শুধু উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জিনের দ্বারাই গঠিত হয় না বাহ্যিক পরিবেশেরও যথেষ্ট প্রভাব থাকে চরিত্রে। একটি ক্লোন মেয়ে দেখতে অবিকল তার দাতা মায়ের মতো হবে সন্দেহ নেই কিন্তু তার বড়ো হয়ে ওঠার সময় ও পরিবেশ তার জন্মদাতা মার বড়ো হওয়ার সময় পরিবেশ থেকে ভিন্ন। ফলে তার আচার-আচরণ, বিশ্বাস, স্বভাব, চরিত্র মা থেকে ভিন্ন হবে।

এবার একটি ক্লোন জন্মদাতা মার কথা ভাবা যাক। তার শৈশব, কৈশোরের কথা সে ভোলেনি। সে এখন ক্লোনিঙের মাধ্যমে জীবন শুরু করতে নানাদিকে প্রলুব্ধ হবে। তার ইচ্ছা হবে ক্লোনকে সেসব ভুল করা থেকে বিরত রাখতে যা সে নিজে বেড়ে ওঠার সময় করেছে। প্রথম জীবনে মা যা যা করতে চেয়েছিল ক্লোনকে জোর করে তা করাতে বাধ্য করবে। এ দুইয়ের সম্পর্কের টানাপড়েনে কি হবে তখন? মা-বাবা ও সন্তানদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ অসাধারণ কিছু নয়। কিন্তু এ কথা কি করে মেনে নেওয়া যায় যে ক্লেনিঙে জন্ম দেওয়া সন্তান তার মার কিংবা বাবার চরিত্রের সম্পূর্ণ উল্টো হবে? তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ক্লোনজাত সন্তানদের মধ্যে দেখা যাবে না? অবশ্য এসবই

অনুমান, বৈজ্ঞানিক রূপকথা। জৈব প্রযুক্তি অনেক কিছুই প্রথমে এরূপ মনে হয়েছিল কিন্তু শেষমেশ তার অনেক কিছুই বৈজ্ঞানিক সত্যে পরিণত হয়। অর্ধশতাব্দী আগেও যদি কোনো বিজ্ঞানীকে প্রশ্ন করা হতো প্রাণীর জিন উদ্ভিদ দেহে প্রতিস্থাপন সম্ভব কিনা, সে বিষয়টিকে নিছক একটি হাসির খোরাক বলেই ভাবতো। আর এখন দেশে দেশে এসব প্রযুক্তির অহরহ সফল প্রয়োগ চলছে।

আমেরিকা সরকার মানব ক্লোনিঙের উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে এবং একদল গবেষক যখন ঘোষণা করেন যে, তারা বানরের ক্লোনিং করেছেন ঠিক তখনই তড়িঘড়ি আইনের সহায়তায় তারা মানবক্লোনিঙের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ব্রিটিশ সরকারও মানব ক্লোনিঙের বিরোধী। তবু আশা করা যায় পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশ হয়তো অদূর ভবিষ্যতে এ প্রযুক্তি সফল করতে সহযোগিতার হাত বাড়াবে। ক্লোনিং পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষ অনন্ত জীবন লাভ করতে পারে। ক্লোনের আয়ও শেষ হলে একের পর এক ক্লোনিং করেই তা সম্ভব হবে। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা মানুষের বৃদ্ধ হওয়ার গতি শ্লথ এবং মৃত্যুরোধ করার বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে গবেষণা করছেন। তারা এমন জিন খুঁজছেন যা মানুষকে অতি মন্থর গতিতে বৃদ্ধ করবে এবং সেই ইপ্সিত জিনটির সন্ধান পেলে সামান্য জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিঙের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা মানুষের বর্তমান আয়ুর সীমা সহজেই দ্বিগুণ করার আশা করছেন।

কানাডার বংশানুগতিবিদগণ মানুষ ও গৃহপালিত জন্তুর ক্ষুদ্রান্ত্রে বসবাসকারী ইলওয়ার্ম নামের একটি পরজীবী কৃমির মধ্যে এমন মিউটেন্ট জিনের সন্ধান পেয়েছেন যা কৃমিটির আয়ু স্বাভাবিকের চেয়ে ছয় গুণ বৃদ্ধি করেছে। এই মিউটেন্ট জিন কৃমির বৃদ্ধির গতি অস্বাভাবিক কমিয়ে দেয়। এটির চলাফেরাও খুব ধীর মন্থর। বিজ্ঞানীরা আশাবাদী মানুষের মধ্যেও অনুরূপ মিউটেন্ট জিনের খোঁজ অবশ্যই পাওয়া যাবে। তবে সমস্যা হলো কোনো মানুষই তার শৈশব ৬০ বছর প্রলম্বিত করবে এমন জিন বহন করতে হয়তো আগ্রহী হবে না। দেহের বিপাকীয় কার্য আশ্চর্য মন্থর গতিতে চলবে, সে শ্লথের মতো অলস, কুড়ে হবে এটা তার অসহ্য লাগবে। তবে সুখের বিষয় ভিন্ন ধরনের আরো কিছু জিন মানুষের দেহে আবিষ্কৃত হয়েছে যা মানুষের বৃদ্ধ হওয়ার গতিকে কমাবে ঠিকই কিন্তু তার শরীরে কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না। এই প্রযুক্তি হয়তো অচিরেই কার্যকর করা যাবে। এটা নিশ্চিত বংশগতিবিদ্যা সম্পর্কিত আমাদের জ্ঞান যখন তমসাচ্ছন্ন দিকগুলো আলোয় উদ্ভাসিত করবে, আমাদের সকলের পরমায়ুও তখন বেড়ে হবে ১০০ বছর বা তারও বেশি।

সব মানুষই তাদের আয়ু বৃদ্ধিতে উৎসাহী হবে খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সমস্যা দাঁড়াবে অন্যত্র। জনসংখ্যার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ যদি অবসর গ্রহণের পরও দীর্ঘদিন বাঁচে তবে কোনো সরকারের পক্ষে তাদের অবসর ভাতাসহ আনুষঙ্গিক সুবিধাদি চালানো

কতোটা সম্ভব হবে? একই অবস্থা দেখা দেবে স্বাস্থ্য পরিসেবাগুলোতে। তাদেরও হিমসিম খেতে হবে এভাবে দীর্ঘদিন ধরে বিপুলসংখ্যক অবসরপ্রাপ্তদের প্রতিনিয়ত চিকিৎসার সুযোগ দিতে। চাপ পড়বে বিশ্বের সীমিত সম্পদভাণ্ডারের ওপরও। এদের খাইয়ে, পরিয়ে, বিনোদনের ব্যবস্থাদির সুযোগ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে। যারা ১৪০ বছর বাঁচবে তাদের চাকরি জীবন হবে অন্যূন ১০০ বছর আর এর বিরূপ ফল পড়বে তরুণদের ওপর। তারা হয়ে পড়বে বেকার। জন্ম হার অপরিবর্তীত থাকলে সমাজে তরুণরা হবে সংখ্যালঘু, প্রাধান্য পাবে বয়স্করা। আধুনিক বংশগতিবিদ্যা হাজারো বছর ধরে আয়ত্ত করা তার অসাধারণ ক্ষমতা বলে আমাদের মানব সমাজের আশ্চর্য পরিবর্তন আনতে সক্ষম। কিন্তু ধর্ম বর্ণে সংস্কৃতিতে শতধা বিভক্ত আমাদের সমাজে বিনা চ্যালেঞ্জে কোনো বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণারই প্রসার ঘটানো সম্ভব হয়নি। বিজ্ঞানীরা তাদের নতুন সৃষ্টি তত্ত্বের উত্তেজনায় বিহ্বল থাকেন, তাদের আবিষ্কার সমাজের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে তা তারা ভাবেন না। অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা দায়ে আবিষ্কারে, ব্যবহারে নয় এ সত্য সমাজের উপলব্ধির বিষয়। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিঙের জগতে যেসব বিস্ময়কর প্রযুক্তি রয়েছে তা ব্যবহার করার পূর্বে আমাদের অবশ্যই ভাবতে হবে সুদূর ভবিষ্যতে সে প্রযুক্তি আমাদের কোন পথে নেবে।

কট্টরপন্থীরা মানুষের জেনেটিক্যাল পরিবর্তনের ঘোর বিরোধী। মানুষ এসব আবিষ্কার করতে পারবে এ বিশ্বাস তাদের নেই। তারা বলছেন ক্লোনিং পদ্ধতিতে মানুষ! জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিঙে অতি মানব তৈরি? এসব অবাস্তব, এসব অনৈতিক। বিজ্ঞান এসব উদ্ভাবন করলেও কোনো সমাজই এ অনৈতিক কর্মকাণ্ড বরদাস্ত করবে না। আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে জৈব প্রযুক্তি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিঙের ব্যাপ্তি এখন সারা বিশ্বে, সব বিজ্ঞানীর নাগালে। প্রয়োজন শুধু প্রশিক্ষণের। সব নামীদামি বৈজ্ঞানিক জার্নালেই এসব প্রযুক্তির কূটকৌশল, ব্যবহারের নিয়মনীতি ছাপা হয়। উন্নত লাইব্রেরিগুলোতে এসব জার্নালের অভাব নেই। একটি ভেড়া ক্লোনিং কীভাবে করতে হবে এসবই এখন জানা। পৃথিবীর যেকোনো স্থানে, যেকোনো সুসজ্জিত ল্যাবরেটরিতে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিঙের গবেষণা সম্ভব। পরমাণু বোমা তৈরিতে যেমন তেজস্ক্রিয় কাঁচামাল পাওয়া দুঃসাধ্য, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিঙের ক্ষেত্রে শুধু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যই যথেষ্ট।

ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া মানব জেনোমের যথেচ্ছ ব্যবহারের বিরোধিতা করলেও পৃথিবীর আরো বহু উন্নত দেশ রয়েছে যারা সাগ্রহে এ গবেষণার কাজে এগিয়ে আসবে। বিজ্ঞানে নৈতিকতা নিয়ে বিশ্বব্যাপী কোনো আইন তৈরি হয়নি, সৃষ্টি হয়নি কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা যারা নিয়ন্ত্রণ করবে গবেষকদের কি করণীয় বা কি করণীয় নয়। রাজতন্ত্রের দেশে রাষ্ট্রপ্রধান একনায়ক, হাতে অসীম শক্তি ও সম্পদ। তাদের এসব গবেষণার কাজে উৎসাহিত করা গেলে আশানুরূপ ফল লাভ অসম্ভব কিছু নয়। ক্লোনিং

পদ্ধতিতে মানুষকে দীর্ঘজীবী করা নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এ উদ্যোগকে ব্যর্থ করার যেকোনো অপচেষ্টা রুখে দাঁড়ানোই সময়ের দাবি। আমেরিকার মতো উন্নত গণতান্ত্রিক দেশেও এমন অনেক ব্যক্তি রয়েছে যারা বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যেতে বা মৃত্যু মেনে নিতে অনিচ্ছুক। তারা অমর হতে চায়। তাদের ইচ্ছা মৃত্যুর পর তাদের দেহ হিমায়িত তরল নাইট্রোজেনে সংরক্ষিত থাকবে। তারা আশাবাদী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জাদুশক্তি নিশ্চয়ই একদিন তাদের মৃতাবস্থা থেকে বাঁচিয়ে তুলবে। তারা ফিরে পাবে তাদের পুরোনো জীবন। এভাবে তারা জীবনের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাধীনতা ভোগ করবে অনন্তকাল। বিজ্ঞানের কাছে নিয়তিকে হার মানতেই হবে একদিন তাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

আর্থিক লাভের উদ্দেশ্যে বহু বাণিজ্যিক কোম্পানি মানুষের পরমায়ু বৃদ্ধি করতে নানা প্রকল্প তৈরি করছে। এইসব প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা এমনসব প্রযুক্তি উদ্ভাবনের চেষ্টা করছেন যা মানুষকে অতিজীবী করবে বা তাকে শারীরিক অমরত্ব লাভের দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নেবে। আধুনিক জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও ক্লোনিং পদ্ধতিতেই তা হয়তো সম্ভব হবে।

(সমাপ্ত)